মহাশ্বেতা দেবীর দৃষ্টিতে আদিবাসী জীবনের সংকট ও মিথ-পুরাণের একাত্মতা

ড. অর্পিতা দাস [১]

ভারতীয় সমাজ প্রাচীনকাল থেকেই চতুর্বর্ণে বিভক্ত। পেশাগত এবং বিত্তগত অসাম্য মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত থাকে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য আমরা চোখেও দেখতে পাই। কিন্তু জাতি ও বর্ণগত পার্থক্যটি খানিকটা ধারণাভিত্তিক, ঠিক বাস্তব নয়। আর্য জাতির প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ থেকেই আমরা এই ধারণার পরিচয় পাই। সেখানে সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষদের বিভিন্ন বর্ণে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণের বৃত্তি; যুদ্ধ এবং রাজ্য শাসন ছিল ক্ষত্রিয়দের কাজ; ব্যবসা বাণিজ্য করতেন বৈশ্যরা এবং এই তিন বর্ণের সেবা করতেন শূদ্ররা। এই বিভাজন থেকেই কিন্তু বোঝা যায় যে বিভিন্ন বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কটি সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিল না। যে সম্মান প্রথম তিনটি বর্ণের মানুষেরা পেতেন শূদ্ররা ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত। শূদ্রদের সামাজিক অধিকারও ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

তবুও এই চতুর্বর্ণ আর্যজাতির যে সমাজ কাঠামো তারই অন্তর্গত ছিল। কিন্তু আর্যরা আসবার আগে ভারতীয় উপমহাদেশে যে আদি অধিবাসীরা বাস করতেন তাঁরা থেকে গেলেন এই চতুর্বর্ণ বহির্ভূত। আর্যদের কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁরা সরে গেলেন দেশের দুর্গম অঞ্চলে ----- অরণ্যে, পর্বতে। তাঁরা কোনোভাবেই আর্য সমাজের অন্তর্গত নন। এই আদিবাসীদের নানা আখ্যায় অভিহিত করা হয়। যেমন ----- আদিবাসী, উপজাতি, খণ্ডজাতি, ভূমিপুত্র, গিরিজন, জনজাতি, পাহাড়িয়া, আরণ্যক ইত্যাদি। এই বর্গের মানুষেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় অবস্থানেই দুর্বল। সেজন্য তাঁদের নিম্নবর্গ বলে অভিহিত করা হয়। এঁরা চিরকাল দুর্বলতার কারণে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের দ্বারা শোষিত, অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হন। উচ্চবর্গের মানুষেরাই এই নিম্নবর্গীয় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বুনো, অসভ্য, বর্বর এবং জংলি বলে থাকেন। উচ্চবর্গের দ্বারা অত্যাচারিত নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের আখ্যান ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। মহাভারতের একলব্য এবং রামায়ণের শম্বুক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক অত্যাচারিত না হলেও এই নিম্নবর্গ এবং শূদ্র বর্ণের মানুষেরা যে সামাজিক মর্যাদায় অনেকটায় নিম্নস্থানে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামায়ণের গুহক, শবরী এবং মহাভারতের বিদুর এবং বিদুর জননী নামহীনা শূদ্র দাসীর প্রসঙ্গে।

প্রাচীন পুরাণ-কথায় বর্ণিত উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষগুলির অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হওয়ার কথা আজও ধারাবাহিকভাবে সমাজে বহমান। পুরাণের কাহিনি আজও বর্তমান সমাজকে অনাবৃত করে দেয় অনেক উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) এমনই একজন লেখিকা যিনি আদিবাসী মানুষের শোষণের কথাকে তুলে ধরেছেন পুরাণের আধারে ----- *"পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।"*[১]

মহাশ্বেতা দেবী একসময় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাঁচি, পালামৌ, দুমকা, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসী মানুষগুলির সঙ্গে মিশেছেন, তাদের জীবন-যাত্রা ও জীবন-সংগ্রামকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাদের উন্নতির জন্য নিজস্ব প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন 'আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ', 'পশ্চিমবঙ্গ মুণ্ডা কল্যাণ সমিতি', 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি', 'আদিবাসী ও হরিজন কল্যাণ সমিতি', 'পশ্চিমবঙ্গ লোধাশবর কল্যাণ সমিতি' প্রভৃতি সংগঠন। নিজের জীবনের কাজকর্মের

[১] অধ্যাপিকা, জে.কে. কলেজ, পুরুলিয়া।

Vol-8, No.-1, May 2017 PANCHAKOTesSAYS ISSN : 0976-4968

অ্যাচিভমেন্ট সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন ----- *"আমি মনে করি আমার জীবনের, সমস্ত জীবনের যদি কোনও অ্যাচিভমেন্ট থেকে থাকে কাজকর্মের একমাত্র অ্যাচিভমেন্ট হল - ট্রাইবাল, আদিবাসী শব্দটা - এরা যে আছে, এবিষয়ে মানুষকে অবহিত করানো৷ সে বিষয়ে গল্প-উপন্যাস লিখে, সে বিষয়ে প্রতিবাদ করে, সে বিষয়ে অনেক কিছু করে তারা যে আছে সেটা প্রতিষ্ঠা করা।"*[২]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি মহাশ্বেতা দেবীর আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করেন। জনৈক সমালোচক লেখিকার এই দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ----- *"পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ করে ধীরে ধীরে মহাশ্বেতা তাদের জীবন যাপনের সান্নিধ্যে এলেন। খানিকটা স্বেচ্ছাব্রত নিলেন এদের উন্নয়নকর্মে। ফলে ঘটতে লাগল তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই তপসিলিভুক্ত ও আদিবাসী সমাজের ইতিহাস পরতে পরতে খুলে যেতে লাগল তাঁর সামনে। সেই ইতিহাসের বাঁকচুরগুলি যে জীবনকে বয়ে নিয়ে এসেছে একালে তাদের প্রতি উপেক্ষা আর অত্যাচার তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে। তিনি সেই যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নানা অভিযোগ দাখিল করে, কিছুটা কাজকর্ম করে, ... আর যেহেতু তিনি লেখক সেই হেতু লেখ্যকর্মে তাকে রূপ দিতে চাইলেন।"*[৩]

মহাশ্বেতা দেবী এইসব অত্যাচারিত, শোষিত, অবহেলিত, উৎপীড়িত আদিবাসী মানুষগুলির কথা অনেক সময় পুরাণের আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন। 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) এবং 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৮) তাঁর এরকমই দুটি উপন্যাস।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'চতুষ্পর্ণা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাঢ়বাংলার মেদিনীপুরের আদিবাসী জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা লেখিকা নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন ----- *"রাঢ়বাংলার মেদিনীভূমের সাধারণ মানুষের জীবনের এই বিপুল বর্ণাঢ্যতা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে, বর্ণশাসিত সমাজের বাইরে যে অরণ্যবাসী আদিবাসী সমাজ মেদিনীপুরে অনন্তকাল ধরে বাস করছে, যারা ভারতের আদিমতম অধিবাসী তাদের সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব, দেবোপাসনা, তাদের টোটেম ও টাবু, বিশ্বাস-প্রথা-ব্যবহার, চান্দ্রবৎসর গণনা, মাতৃকা আরাধনা, তাদের কথা আমার মনে ছিল। আমরা ও তারা একই ভূ-খণ্ডে বাস করি কিন্তু তাদের ধ্যানধারণার জগৎ একেবারে পৃথক, আজও পৃথক, এবং এই দুই জগৎ দুই অস্তিত্বের ব্যাপারটিও আমাকে প্রলোভিত করেছিল। এদের প্রসঙ্গেই আমি আদিম এক অরণ্যহস্তীযূথের প্রতীক ব্যবহার করেছি। যে হস্তীযূথ আজও প্রকৃতির শেষ সম্মানিত প্রতিভূ। পালকাপ্য মুনির আশ্চর্য কাহিনিটি এক আশ্চর্য পুরাকল্পের মতোই মনে হয়েছে আমার। আর আকৃষ্ট করেছে অভয়া-বাশূলী /বিশালাক্ষী - অরণ্যচণ্ডী-পর্ণশবরী - বিন্ধ্যবাসিনী বেদোক্ত-অরণ্যানী, নানা নামে আদিম মাতৃশক্তির উপাসনা, যে মাতৃশক্তি অষ্টম শতক থেকে শাস্ত্রীয় পূজায় আসন পায়।"*[৪]

উপন্যাসটিতে মহাশ্বেতা দেবী অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চুয়াড় প্রজাতির টোটেম ও টাবু-কে ব্যবহার করেছেন। টোটেম হল একটি প্রতীক; যা জনগোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিচিত। এক একটি জনগোষ্ঠী বিশেষ কোনো গাছ, ফুল, ফল, জন্তু, পাখিকে তাদের টোটেম হিসাবে গ্রহণ করে। টাবু হল নিষেধাজ্ঞা জনিত সংস্কার। যা না মানলে শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় টোটেম ও টাবু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। চুয়াড়দের টোটেম হল হস্তি। তারা নিদয়ার জঙ্গলের রক্ষাকর্তা ----- *"হস্তিযূথ এ অরণ্যের আদিমতম সম্রাট। তারা দেবী পর্ণশবরী, অরণ্যরক্ষয়িত্রীর সন্তান। ... নির্ভয়ে, সগর্বে, ভয়ঙ্কর কোনো অমোঘ শক্তির মত তারা বন থেকে বনে বিচরণ করে। অরণ্যরক্ষয়িত্রী দেবীর সচল প্রহরী তারা, অরণ্যবাসী আদিম চুয়াড় জাতি ছাড়া কেউ হস্তিবিদ্যা জানে না।"*[৫] চুয়াড়দের টাবু হল, *"চুয়াড়দলের কেউ যদি জাত তেজে অরণ্য ছেড়ে আসে, তার মরণ কোনো-না-কোনো ভাবে হাতির হাতে। এটি একটি পরীক্ষা করা সত্য। ভালোবেসে, লোভে, মোহে, দুরাকাঙ্ক্ষায়, যদি কোনো চুয়াড়-সন্তান অরণ্য ত্যেজে আসে, হাতির হাতে সে কোনো-না-কোনোভাবে মরবে।"*[৬] তাছাড়া তারা সব সময় হাতির সঙ্গে থাকলেও হাতির জন্ম, মৃত্যু এবং সঙ্গমলীলা দেখা নিষিদ্ধ।